:: पुष्पिका ::

:: ভূমিকা ::

"সংসারে মানুষ যে আপনাকে প্রকাশ করিতেছে সেই প্রকাশের দুইটি মোটা ধারা আছে। একটা ধারা মানুষের কর্ম, আর - একটা ধারা মানুষের সাহিত্য" [১] — রবীন্দ্রনাথের এই বক্তব্যের পেছনে তাঁর সমাজচেতনা ও সাহিত্য-চেতনা এই দুটো ধারাই অবলম্বিত। সাহিত্য সমাজজীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীসম্পর্কেই জড়িত। বিশেষ করে তেইন (Hippolyte Taine — (1828 – 93) সাহিত্যের ইতিহাস (Histoire de la Litterature anglaise - 1863) আলোচনায় সমাজ - ইতিহাসের ধারার সঙ্গে যে সাহিত্যও কার্য্য কারণগতভাবে যুক্ত তা দেখানোর পর থেকে এই ব্যাপারটি সাহিত্য সমালোচনায় গৃহীত সত্যের মর্যাদা পেয়েছে। আর মার্কসবাদী সমালোচনার ধারা সাহিত্য সমালোচনায় একটি উল্লেখযোগ্য শাখা হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাবার পর থেকে সকলেই বিশ্বাস করেন যে অর্থনীতি - রাজ-নীতি - নির্ভর সমাজের নিয়ুভিত্তির (basis) উপর সাহিত্য ও শিল্পকলার উপরের কাঠামো (Super-structure) গড়ে ওঠে।

কিন্তু সমাজ জীবনের প্রভাব সাহিত্যের সর্বস্তরে সমপরিমাণে পড়ে না। উপন্যাসে যেখানে সমাজের পটভূমিকায় ব্যক্তির বিকাশ রূপায়িত হয় সেখানে সমাজের প্রভাব অনেক বেশী প্রত্যক্ষ। জীবনসামগ্রিকতাই উপন্যাসের ভিত্তি - প্রস্তর স্থাপিত। সেই কারণেই উপন্যাসের উদ্ভব সম্পর্কে যাঁরা সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করেছেন তাঁরা উপন্যাসকে বলেছেন আধুনিক বুর্জোয়া সভ্যতার মহাকাব্য। আখ্যানকাব্যে এবং নাটকে সমাজপ্রভাব প্রত্যক্ষভাবে অনুভূত হয় — বিশেষত নাটকে। কারণ নাটক শুধু লিখিত সাহিত্য নয় — নাটক অভিনেয়-ও বটে। নাটককে যেহেতু সমকালে অভিনয়গত সার্থকতা অর্জন করতে হয় সেই কারণে সমকালীন সামাজিক মানুষের সুখ দুঃখের সঙ্গে সংযুক্ত না হয়ে

১। বিশ্বসাহিত্য, সাহিত্য, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৩৬৪, পৃষ্ঠা - ৬০।

নাটক সার্থক হতে পারে না। ফলে এমনি অনিবার্যভাবেই সমাজপ্রভাব নাটকে এসে যায় — এবং তা অবশ্যই প্রত্যক্ষভাবে। কিন্তু গীতি কবিতায় সমাজের প্রভাব অনেকখানিই পরোক্ষ — কখনো কখনো তা এতই প্রচ্ছন্ন যে নিবিষ্ট অনুসন্ধানের বিষয় হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ প্রধানত গীতিকবি। গীতিকবিতাকে বলা হয়ে থাকে কবির স্বগতোক্তি। গীতি কবিতা বিশেষভাবে আত্মপ্রধান কবিতা। এই আত্মপ্রধানের মাহাত্ম্যে বহিরঙ্গ জগত-ও অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠে গীতিকবিতায়। রবীন্দ্রনাথের কবিস্বভাব সমাজসম্পর্কিত ভাবনাকে পরোক্ষভাবেই বেশী তুলে ধরেছে। তাঁর কবিতায় তবু প্রত্যক্ষ ভাবনাও অপ্রতুল নয়। রবীন্দ্রনাথের সমাজচেতনা মূলতঃ মানবধর্মী। দেশ কালে বিধৃত মানবজীবন ও সেই মানবের নানাবিধ সমস্যাবলীর প্রসঙ্গ দেখা দিয়েছে তাঁর কবিতায়। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ভাবনা কিভাবে প্রতিফলিত হয়েছে তার উপস্থাপনা এই গবেষণা নিবন্ধে অনুসন্ধানের বিষয়।

'মানসী' কাব্যগ্রন্থ রচনার পূর্ব পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথকে বলা যেতে পারে হৃদয়ারণ্যের কবি। নিজের ভাবজগতের বাষ্পময় অশরীরী মূর্তিগুলি এই সময়ে তাঁর কবিতায় বারে বারে ফিরে ফিরে এসেছে। 'মানসী'র পরে 'সোনারতরী'র যুগে যখন তিনি বহির্জগতের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন তখনই যেন রবীন্দ্রনাথ আপন হৃদয়ের বাইরে বেরিয়ে এসে মহাকবির মহিমার দিকে অগ্রসর হলেন। 'সোনারতরী'র 'আকাশের চাঁদ' কবিতাটির অংশ বিশেষের উল্লেখ থেকে তা বোঝা যায় —

অবশেষে যবে জীবনের দিন
আর বেশি বাকি নাই,
এমন সময়ে সহসা কী ভাবি
চাহিল সে মুখ ফিরে,
দেখিল ধরণী শ্যামল মধুর
সুনীল সিন্ধুতীরে।
সোনার ক্ষেত্রে কৃষাণ বসিয়া
কাটিতেছে পাকা ধান,

ছোটো ছোটো তরী পাল তুলে যায় ,
মাঝি বসে গায় গান ।
দূরে মন্দিরে বাজিছে কাঁসর ,
বধূরা চলেছে ঘাটে ,
মেঠো পথ দিয়ে গৃহস্থজন
আসিছে গ্রামের হাটে ।
নিশুম ফেলি রহে আঁখি মেলি ,
রহে ম্রিয়মাণ মন ,
'পলী মাঝি চাই যদি ফিরে পাই
আরবার এ জীবন ।'

পাবনা জেলার জমিদারী পরিদর্শন ব্যাপারের জেলদুন করেই তিনি বৃন্দাবনের জটিলতা থেকে বেরিয়ে মুক্ত বহির্জগতে আত্মপ্রকাশ করলেন তার সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্য করা গেল তাঁর কবিতায় যেন এক গুণগত পরিবর্তন ঘটে গেছে । ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দে বঙ্গ ভঙ্গ আন্দোলনের সময় প্রত্যক্ষভাবে রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ । তারপর পাবনা কনফারেন্সে যোগদান করলেন । যুক্ত হয়ে পড়লেন বরিশাল কনফারেন্স , কলকাতা কনফারেন্স প্রভৃতির সঙ্গে । বঙ্গ ভঙ্গ আন্দোলনে যোগদানের প্রত্যক্ষ ফল হিসেবে রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত স্বদেশী গানগুলি পাওয়া গেল । পরবর্তীকালে অবশ্য বঙ্গ ভঙ্গ আন্দোলনের লক্ষ্য , পথ ইত্যাদি সম্পর্কে তাঁর মনে সংশয় জেগে ওঠে এবং রাজনীতির প্রত্যক্ষ সংস্রব থেকে কবি অনেকটা দূরে সরে আসেন । তবে এ-ও সত্য যে জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস ঘটনা এবং পর পর আরো অনেক সামাজিক , রাজনৈতিক ঘটনা রবীন্দ্রনাথকে রাজনীতি থেকে দূরে থাকতে দেয়নি এবং কবিও সে সব ক্ষেত্রে আপন মতামত এবং আপনার ক্ষুব্ধতাকে বাইরে প্রকাশ না করে মুক্তি পান নি । এই যে রাজনীতি , সমাজনীতির সঙ্গে ঈষৎ দূরত্ব বজায় রেখেও তাঁর নিত্য সংস্রব - তার সেই ব্যাপার তাঁর কাব্যধারাকে কিভাবে প্লাবিত করেছে ভাবলে বিস্মিত হতে হয় । সাহিত্যের উপরে সমাজসম্পর্কের ছাপ

কি রকমভাবে ফুটে ওঠে একজন বড়ো কবির ক্ষেত্রে এটা যাচাই করে দেখবার অপেক্ষা রাখে । রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁর নিজের কালের বিবেক , কালের সাক্ষী এবং কালের শিক্ষক । তাঁর কবিপ্রতিভায় চিরকালের স্তব্ধতার সঙ্গে চলতিকালের চঞ্চলতাও মূর্ত হয়ে উঠেছে । আবার তাঁর কবিতায় অবলম্বিত এক একটি ঘটনা বা প্রসঙ্গ যেন প্রায় অলৌকিকভাবে বিশেষ ঘটনার গণ্ডীকে অতিক্রম করে নির্বিশেষ সত্যের মহিমা অর্জন করেছে ।

প্রশ্ন উঠতে পারে সমগ্র রবীন্দ্রকাব্যের মধ্যে বিশেষ করে দুই মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তীকালের কাব্যকে আলোচনার সামগ্রী রূপে নির্দিষ্ট করা হলো কেন । দুই মহাযুদ্ধের অন্তর্বর্তীকাল দেশ ও আন্তর্জাতিক আকাশে বিশেষ যুগ - সচেতনতার পরিচয় বহন করে । দুই মহাযুদ্ধ — এই শব্দ দুটিতেই ভয়াবহ চমক আছে , যা সমাজকে সমাজ - মানসিকতাকে মুহূর্তে সজাগ করে তোলে । কিন্তু এর চেয়েও বড়ো কথা রবীন্দ্রনাথ এই পর্বের সূচনাতেই বিশ্বের দরবারে আপনাকে পৌঁছে দিয়েছিলেন । ১৯১৩ খ্রীস্টাব্দে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির পর রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের নাগরিক থেকেও যেন বিশ্ব - নাগরিকে রূপান্তরিত হলেন । ফলে তাঁর জীবন ও কার্যকলাপের পটভূমি বিপুল বিস্তারলাভ করলো । বিশ্বপথিক রবীন্দ্রনাথ আপন দেশ , সমাজ ও বিশ্বের বিবিধ প্রসঙ্গে আপনার মতামত দেবার অধিকার লাভ করলেন যেন । তাঁর নোবেল পুরস্কার-লাভ আর মহাযুদ্ধের ঘটনা এই দুটো একই সঙ্গে মিলে গিয়ে রবীন্দ্র - চিত্তকে করে তুললো অশেষ তাৎপর্যমণ্ডিত । এই সময় থেকে শুধু আর জাতীয় জীবনের ঘটনাতরঙ্গ নয় , আন্তর্জাতিক জীবনের ঘটনাধারাও কবির মর্মকে স্পর্শ করলো । সুতরাং এই পর্বের কাব্যবিচার করতে গেলে রবীন্দ্রনাথকে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতার পটভূমিতেই প্রতিষ্ঠিত করে নিতে হয় । আক্ষরিক নিয়মে ১৯০১ থেকে শুরু হলেও প্রকৃতপক্ষে বিংশ শতাব্দীর জন্ম হয়েছে ১৯১৪ খ্রীস্টাব্দে প্রথম মহাযুদ্ধের কামান - নির্ঘোষের সঙ্গে সঙ্গে । তাই এই বছরটিকেই বাস্তব চিন্তার জগতে ও সেইসঙ্গে সাহিত্যক্ষেত্রেও আধুনিকতার সূচনাকাল বলা হয়ে থাকে । দুই মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তী রবীন্দ্রকাব্য আলোচনা করে এটিই দেখবার বিষয় যে এই আধুনিক কালকে রবীন্দ্রনাথ কিভাবে

কবিতায় গ্রহণ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের জীবনাবসানও ঘটে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বিপর্যয়ের মধ্যে। প্রধানত এই দুই কারণেই রবীন্দ্রকাব্যের এই কালখণ্ডকে অর্থাৎ 'বলাকা' থেকে তাঁর পরবর্তী কাব্যধারা আলোচনার বিষয় হিসাবে নির্বাচিত।

'বলাকা' থেকে 'শেষলেখা' পর্যন্ত কাব্যগুলোকে তিনটি অধ্যায়ে ভাগ করে নেওয়া হয়েছে আলোচনার ক্ষেত্রে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে 'বলাকা' থেকে 'পরিশেষ', তৃতীয় অধ্যায়ে 'পুনশ্চ' থেকে 'শ্যামলী', আর চতুর্থ অধ্যায়ে 'প্রান্তিক থেকে 'শেষলেখা' পর্যন্ত কাব্যগ্রন্থসমূহ স্থান পেয়েছে। 'বলাকা' থেকে দ্বিতীয় অধ্যায়ের আলোচনা শুরুর কারণ আগেই বলা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ের আলোচনার সূত্রপাত 'পুনশ্চ' থেকে ঘটানোর পেছনেও কারণ আছে। জগত ও জীবনকে দেখবার পেছনে কবির নতুনতর দৃষ্টিভঙ্গী সেখানে ক্রিয়াশীল। "বিষয়বস্তু নির্বাচনের অভিনবত্ব "পুনশ্চ" হইতেই দৃষ্টিগোচর, তাহার মধ্যেই রূপ পরিবর্তনের প্রথম প্রমাণ, কিন্তু সর্বাপেক্ষা বড় প্রমাণ দৃষ্টিভঙ্গির নূতনত্ব। এই নবাবিষ্কৃত দৃষ্টিভঙ্গিই নূতন রীতি - প্রবর্তনের হেতু।"[২] এই নূতন ভঙ্গী, নূতন রীতিই 'পুনশ্চ' থেকে নূতন অধ্যায়ের সূচনাগত কারণ। আর 'প্রান্তিক' কাব্যগ্রন্থ কবির আপন মৃত্যু - অভিজ্ঞতাত দ্বিতীয় অংশের সূচনাচিহ্ন স্থাপিত। জগতকে এবং বিশ্বরহস্যকে নতুন উপলব্ধ তাৎক্ষণিক সত্য দিয়ে যেন যাচাই করে দেখছেন রবীন্দ্রনাথ। এই অভিজ্ঞতারই ক্রমবিবর্তন চলেছে তাঁর 'শেষলেখা' পর্যন্ত কাব্যগ্রন্থগুলোতে। তাই 'প্রান্তিক' থেকেই আবার একটি ভিন্ন অধ্যায়ের সূচনা করা হয়েছে আলোচ্য নিবন্ধে। দেশ কাল সমাজ রাষ্ট্রনীতি ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে ও তার সঙ্গে রবীন্দ্রকবিতার সম্পর্ক নির্ণয় যদিও মূল লক্ষ্য তবু আলোচ্য বিষয় যেহেতু কবিতা তাই তার কাব্যোৎকর্ষের প্রসঙ্গও বিবেচ্য। এই সূত্রে কবিতার আঙ্গিক বিচারের প্রশ্নটিও এসে পড়ে। কাব্যরূপ ও রীতির আলোচনা যেহেতু ধারাবাহিকতার অপেক্ষা রাখে সেইজন্য সর্বশেষ পঞ্চম অধ্যায়ে 'বলাকা' থেকে 'শেষ লেখা' পর্যন্ত একটানা একটি অধ্যায়ে এই বিষয়টি আলোচিত হয়েছে।

****

২। রবীন্দ্র - সাহিত্যের ভূমিকা –

নীহাররঞ্জন রায়, ১৩৬৯, পৃষ্ঠা ১১৬।

আরম্ভের আগেও যেহেতু আরম্ভ থাকে তাই পূর্বাভাসে অর্থাৎ প্রথম অধ্যায়ে তাঁর 'বলাকা' পর্বে পৌঁছনোর পূর্বের রূপ — কেমন করে রবীন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে দেশ ও বিশ্বের নানাবিধ ঘটনার সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে পড়লেন আর কবিতায় তার প্রকাশ ঘটতে থাকলো , কেমন করে 'গীতালি'র রবীন্দ্রনাথ আপন থেকে বাহির হয়ে বিশ্বলোকের সাড়া পেলেন বুকের মাঝে — এই ভাবনার কথাই বলা হয়েছে ।

১৯১৪ থেকে ১৯৪১ এই সময়ে দেশের স্বাধীনতা , দেশের রাজনৈতিক অবস্থা, ভারতের বুকে বিদেশী শাসকের শাসন ও শোষণ , দুটো আন্তর্জাতিক যুদ্ধ - ঝড় তার কূটনীতি ইত্যাদির টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মুক্তির প্রশ্নটি বড়ো হয়ে দেখা দেয় । এক্ষেত্রে নারী পুরুষ দুয়েরই মুক্তির প্রশ্ন জড়িত । ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে নারীমুক্তির যে প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল এই সময়ে এসে তা বিভিন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষ গুরুত্ব পায় এবং রবীন্দ্রনাথ তাকে বিশিষ্ট দৃষ্টিকোণ থেকেই দেখেছেন । এই ব্যাপারটি তাই পৃথকভাবেই আলোচ্য । আর রবীন্দ্রকবিতায় এটি 'পলাতকা' পর্ব থেকেই বিশেষভাবে চোখে পড়ে ।

আন্তর্জাতিক অবস্থার সঙ্গে অর্থনৈতিক প্রশ্নটি জড়িত — একে যেমন আলাদা করে দেখা যায় না তেমনি হিন্দু - মুসলমানের সম্পর্ক ও তাদের অন্তর্বিরোধের বিষয়টিও এদেশে ব্রিটিশ শাসন ও দেশীয় রাজনীতির সঙ্গেই যুক্ত । এই দুটো বিষয় তাই রাজনৈতিক বিষয়ের আলোচনার প্রসঙ্গেই উপস্থাপিত হয়েছে । সমাজে নারীর পরাধীনতার পেছনে , হিন্দু মুসলমানের বিরোধের পেছনে সামাজিক কুসংস্কার এবং ধর্মীয় কুসংস্কার কাজ করেছে । আবার অস্পৃশ্যতাকেও রবীন্দ্রনাথ দেখেছেন সামাজিক কুসংস্কারের একটি অন্যতম দিক হিসেবে আর কবিতাতেও তা ধরা দিয়েছে । এ বিষয়টিকেও আলোচনার অঙ্গীভূত করা হয়েছে ।

আলোচ্য নিবন্ধে কাব্যগ্রন্থ ধরে আলোচনা এগোলেও অনেক সময় পরে প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত কিছু কিছু কবিতা রচনাসময়ের দিকে লক্ষ রেখে পূর্ববর্তী কাব্যগ্রন্থ আলোচনার সময়েই পর্যালোচিত হয়েছে । দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বিচিত্র ঘটনাবর্ত ও সাহিত্যাদর্শগত বিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯১৪ থেকে ১৯৪১ মানব ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় । ১৯১৪, ৪ আগস্ট যুদ্ধ ঘোষণার আগে থেকেই রবীন্দ্র মনের

তাঁর সমাজ - সচেতনতা ও তার প্রতিক্রিয়ায় কাব্য ক্ষেত্রে কতকগুলি নতুন তরঙ্গ লক্ষ্য করা যায় — (ক) যৌবনবন্দনা (খ) বুদ্ধচেতনা (গ) জড়ত্ব - মোচন - চিন্তা (ঘ) শক্তিচেতনা (ঙ) মুক্তি - সাম্রাজ্যবাদ ও পরাধীনতা থেকে (চ) সঙ্কীর্ণ স্বাদেশিকতা ও আন্তর্জাতিক চেতনা (ছ) নারীমুক্তি (জ) সামাজিক কুপ্রথা, কুসংস্কারের বন্ধন থেকে মুক্তি (ঝ) অর্থনৈতিক মুক্তি। এগুলি অবশ্য পারস্পরিক সম্পর্কে অন্বিত। সমাজ - সম্পর্ক বিষয়ে কবির চিন্তা চেতনার যে প্রসার সূত্রগুলি পাওয়া গেলো কমবেশী সেই সূত্রগুলিরই সম্প্রসারণ ঘটেছে রবীন্দ্র কবিতায় তার গভীরতার ব্যঞ্জনায় সেই সূত্রগুলিকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিশ্ববীক্ষার আলোকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। মানুষের পরিপূর্ণতার পথে তার সর্বাঙ্গীন মুক্তিই লক্ষ্য ছিল কবির। এই লক্ষ্যের দিকে তাকিয়ে তাঁর সমাজচিন্তার ধারা কতকগুলি ক্ষেত্রকে বিশেষভাবে স্পর্শ করেছে। আর এই মানব মুক্তির পথে যে সব প্রতিবন্ধকতা তা - ও তাঁর চেতনাকে বিশেষভাবেই উদ্দীপ্ত করেছে। প্রথম মহাযুদ্ধের সমাপ্তির বেশ কিছু পরে রবীন্দ্রনাথ 'সত্যের আহ্বান' প্রবন্ধে বলেছিলেন, —

"একটি কথা আমাদের মনে ভাববার দিন এসেছে, সে হচ্ছে এই — ভারতের আজকের এই উদ্বোধন সমস্ত পৃথিবীর উদ্বোধনের অঙ্গ। একটি মহাযুদ্ধের তূর্যধ্বনিতে আজ যুগারম্ভের দ্বার খুলেছে। . . . হঠাৎ এক দিনে আধুনিক সভ্যতা অর্থাৎ পাশ্চাত্য সভ্যতার ভিত কেঁপে উঠল। বোঝা গেল, এই কেঁপে ওঠার কারণটা স্থানিক নয় এবং ক্ষণিক নয় — এর কারণ সমস্ত পৃথিবী জুড়ে। মানুষের সঙ্গে মানুষের যে সম্বন্ধ এক মহাদেশ থেকে আর - এক মহাদেশে ব্যাপ্ত, তার মধ্যে সত্যের সামঞ্জস্য যতক্ষণ না ঘটবে ততক্ষণ এই কারণের নিবৃত্তি হবে না। এখন থেকে যে - কোনো জাত নিজের দেশকে একান্ত স্বতন্ত্র করে দেখবে, বর্তমান যুগের সঙ্গে তার বিরোধ ঘটবে, সে কিছুতেই শান্তি পাবে না। এখন থেকে প্রত্যেক দেশকে নিজের জন্য যে চিন্তা করতে হবে তার সে চিন্তার ক্ষেত্র হবে জগৎজোড়া।

চিত্তের এই বিশ্বমুখী বৃত্তির চর্চা করাই বর্তমান যুগের শিক্ষার সাধনা ।" [৩]

এই দৃষ্টিভঙ্গী দিয়েই বাহিরের জগৎকে যেমন বিচার করেছেন কবি তেমনি তাঁর গদ্যরচনায় তো বটেই এমন কি কাব্য কবিতার পেছনেও তাঁর এই মনন-কল্পনা ক্রিয়াশীল ।

শুধুমাত্র বিষয়গত আলোচনাই বর্তমান নিবন্ধের একমাত্র লক্ষ্য নয় । আগেই উল্লিখিত হয়েছে গীতিকবিতায় সমাজ প্রভাব সবচেয়ে দুর্লক্ষ্য এবং পরোক্ষ । কিন্তু সেই সমাজ প্রভাব আরও যেখানে পরোক্ষ , আরও যেখানে প্রচ্ছন্ন ও অন্তঃশীল – কবিতার আঙ্গিকের সেই ক্ষেত্রও বিবেচনার বিষয়ীভূত করা হয়েছে । রবীন্দ্র কবিতার ছন্দোগত বিবর্তনে , কবিতায় উপমা ব্যবহারে আর শব্দ নির্বাচনে ও তার প্রয়োগগত বিবর্তনে সমাজ-প্রভাব যে কতোখানি সুদূর অথচ স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করেছে সে-ও সীমিত সাধ্যের মধ্যে আলোচিত হয়েছে এই নিবন্ধের পঞ্চম অধ্যায়ে ।

কোনো নূতন তত্ত্ব উপস্থাপনার দাবী নয় – পুরাতন তথ্যকেই নূতনভাবে উপস্থাপনার দ্বারা রবীন্দ্রকাব্যকে একটি যৌগিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে আলোচনার চেষ্টা রয়েছে বর্তমান নিবন্ধে । রবীন্দ্রকাব্য কবিতায় সমাজপ্রভাব সম্পর্কে ইতিপূর্বে বিক্ষিপ্তভাবে অল্প বিস্তর আলোচনা হয়েছে কিন্তু যতদূর জানা যায় এই সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ও ধারাবাহিক আলোচনা বিরল । এই বিরলতাই এই আলোচনার সূত্রপাত ঘটিয়েছে ।

****

৩। কালান্তর , রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্ররচনাবলী, ত্রয়োদশ খণ্ড , জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ , পৃষ্ঠা - ৩০৪ ।